BANGLA KOUNTERKULTURE ARCHIVE MAGAZINE

004 / JULY 2015

কভার ফটো: কিউ

১. ইয়েভগেনে আলেকসান্দ্রভিচ ইয়েভতুশেঙ্কো সুরজিৎ সেন

ইয়েভতুশেঙ্কো

ইয়েভতুশেঙ্কো কি এখনো বেঁচে আছেন? জানি না। ২০০৯ সাল অবধি বেঁচে ছিলেন জানি, তখন তাঁর বয়স ৭৭। পিতৃদত্ত নাম ছিল ইয়েভগেনে আলেকসান্দ্রভিচ গ্যাংনাস, উনি মায়ের পদবি ইয়েভতুশেঙ্কো ব্যবহার করতেন, এটা ছিল তাঁর পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ইয়েভতুশেঙ্কো ছিলেন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রতিবাদী কবি। যে রাশিয়াকে অমলদারা বলতেন সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। ইয়েভতুশেঙ্কোর দীর্ঘ কবিতা 'জিমা জংশন' অনুবাদ করেছিলেন অমলদা। ওঁরই প্ররোচনায় ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে গিয়ে ইয়েভতুশেঙ্কোর বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছিলাম। ইয়েভতুশেঙ্কো ছিলেন তাতার—ইউক্রেনীয় রক্তের বংশধর। জন্মেছিলেন ইর্কুটুস্ক অঞ্চলের জিমা নামে একটা ছোট্ট শহরে, যা আসলে একটা কৃষিপ্রধান গ্রাম। ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলওয়ের সাইবেরিয়াগামী ও ফেরত ট্রেনগুলি তাদের দীর্ঘ যাত্রাপথের মাঝে এখানে একটু জিরিয়ে নিত।

১৯৮৩ সাল। সবে কলেজ পাশ করে বেরিয়েছি। নকশালমুগ্ধতায় ছেয়ে আছে মন। মানে প্রাক্তন নকশাল দেখলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অ্যাড্রেনালিনে অতিরিক্ত ক্ষরণ। রোজগার বলতে এদিক ওদিক খুঁটে খাওয়া। সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ৩৬ ঘাটের জল খেয়ে গভীর রাতে অভিভাবকের চিন্তা ১০ গুণ করে বাড়ি ফেরা। এই সময় আলাপ হয় অমলদার সঙ্গে। যিনি ছিলেন প্রাক্তন নকশালপন্থী, তার ওপর জেল খাটা। কে যে আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আজ আর মনে নেই। অমলদা কি এখনো বেঁচে আছেন? জানি না। ১৯৮৬ সাল অবধি বেঁচে ছিলেন জানি, তখন তাঁর বয়স ৪৬।

৬ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা এই সাইবেরিয়ান কবির নাম আমি প্রথম শুনি অমলদার কাছে, রাজ্য সরকারের চাকরি করতেন অমলদা, অনুবাদ বিভাগে। যেখানে নাকি প্রায় কোনো কাজই নেই। উত্তর কলকাতার ফড়েপুকুরের দিকে পেয়ারাবাগানে একটা বাংলা মদের ঠেকে অমলদার সঙ্গে প্রায় যাওয়া হত দুপুরের দিকে। সেই ঠেকের ঘরটি ছিল ক্লাসরুমের মতো, সারি সারি হাই বেঞ্চ গ্লাস, সোডার বোতল ইত্যাদি রাখার আর লো বেঞ্চ বসার জন্য। শুধু একটি ব্ল্যাকবোর্ড আর একজোড়া চেয়ার টেবিল এবং অবশ্যই একজন শিক্ষক—এইগুলো থাকলেই তাকে ক্লাসরুম বলা আটকায় কে? বলা বাহুল্য, ঠেকটিকে আমরা ক্লাসরুমই বলতুম। বেশ কিছুদিন দেখা না হলে অমলদা বলতেন, 'কী ব্যাপার লেখাপড়ার পাট তুলে দিলে নাকি? এত ক্লাস ফাঁকি দিও না।'

ওই ক্লাসেই দুপুরবেলা প্রায় ফাঁকা ঘরে জানলার ধারে বসে অমলদা আমাকে তার করা অনুবাদে (ইংরেজি থেকে) ইয়েভতুশেঙ্কোর কবিতা শোনাতেন। কেন? ইয়েভতুশেঙ্কো ছিলেন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রতিবাদী কবি। যে রাশিয়াকে অমলদারা বলতেন সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। ইয়েভতুশেঙ্কোর দীর্ঘ কবিতা 'জিমা জংশন' অনুবাদ করেছিলেন অমলদা। ওঁরই প্ররোচনায় ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে গিয়ে ইয়েভতুশেঙ্কোর বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছিলাম।

ইয়েভতুশেঙ্কো ছিলেন তাতার—ইউক্রেনীয় রক্তের বংশধর। জন্মেছিলেন ইর্কুটুস্ক অঞ্চলের জিমা নামে একটা ছোট্ট শহরে, যা আসলে একটা কৃষিপ্রধান গ্রাম। ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলওয়ের সাইবেরিয়াগামী ও ফেরত ট্রেনগুলি তাদের দীর্ঘ যাত্রাপথের মাঝে এখানে একটু জিরিয়ে নিত। তাই ছোটো হলেও জিমার স্টেশনটি জংশনের মান্যতা পেয়েছিল। ট্রেনের বেশিরভাগ যাত্রীরাই ছিল সাইবেরিয়ার নির্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত। হয় তারা নির্বাসনে যাচ্ছে অথবা মেয়াদ শেষে ফিরছে, যদিও খুব কম মানুষই ফিরত। জিমা আর ওকা এই দুটি নদী ও নিচু জমি হওয়ার কারণে জিমা শহরটি বছরের বেশির ভাগ সময়ই জলবন্দি থাকত। পরবর্তীকালে ইয়েভতুশেঙ্কোর জন্ম শহর বলে জিমা খ্যাতি পায়।

ইয়েভতুশেঙ্কোর পরিবার থাকার জন্য এরকম একটা শহর কেন বেছে নিল? তাঁর মাতৃকুলের প্রপিতামহ ১৮৮১তে রাশিয়ান সম্রাট জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অপরাধে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন ও যাত্রাপথেই মারা যান। তাঁর পিতামহ ও মাতামহ, উভয়েই স্ট্যালিনের আমলে রাষ্ট্রের শত্রু নির্বাচিত হন ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। যদিও তাঁর মাতামহ রাশিয়ার বিপ্লবে রেড আর্মির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। যে পরিবারে পুরুষানুক্রমে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হবার ঐতিহ্য আছে তারা সাইবেরিয়া যাবার পথেই বাড়ি করে থাকবে এ আর আশ্চর্য কী!

ইয়েভতুশেঙ্কোর বাবা ছিলেন ভূবিজ্ঞানী, মা গায়িকা। তাঁর ৭ বছর বয়সে বাবা-মায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। ১৮ বছর বয়সে ইয়েভতুশেঙ্কো মস্কো শহরে গোর্কি সাহিত্য স্কুলে ভর্তি হন স্নাতক হবার জন্য। কিন্তু মাঝপথে কলেজ ছেড়ে দেন, ডিগ্রি না নিয়েই। তারপর কবিতা লিখতে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যে কবি হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। 'বাবি ইয়ার' বইটি তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। ইয়েভতুশেঙ্কো শিল্পীর স্বাধীনতার পক্ষে সবসময় কথা বলেছেন। শুধু কবিতা নয়, উপন্যাস লেখা, ফিলম পরিচালনা করা, অভিনয়—সব কিছুই করতেন তিনি। ক্রুশ্চেভের আমলে তিনি স্ট্যালিনবাদী আমলাতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করে বেশ বিপদেই পড়েছিলেন। 'স্ট্যালিনের সৎকার' বা 'স্ট্যালিনস ফিউনারেল' নামে একটি ফিলমও করেন তিনি পরবর্তীকালে। সলঝেনেতিসনকে ব্রেজনেভ সরকার গ্রেপ্তার করে নির্বাসন দিলে, ইয়েভতুশেঙ্কো

একটি প্রতিবাদ টেলিগ্রাম পাঠান ব্রেজনেভকে। এসব সত্ত্বেও ইয়েভতুশেঙ্কোর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, ওনার এই সব প্রতিবাদ লোক দেখানো, কারণ সরকার তো ওঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না! ওঁনাকে শাস্তিও দেয় না!!

ইয়েভগেন আলেকসান্দ্রভিচ ইয়েভতুশেঙ্কো এমন এক চরিত্র যাঁকে বাম বা দক্ষিণপন্থী বলে চিহ্নিত করা যায় না। উনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় এক লিবারেল কণ্ঠস্বর। ■

ইয়েভতুশেঙ্কো

ODDJOINT # বাংলাব্ল্যাক্

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

আষাঢ় ১৪২২ ● জুলাই ২০১৫

 স্বমেহন

তমোঘ্ন হালদার

সময়টা ক্লাস এইটের মাঝামাঝি। ফটর ফটরের দিক দিয়ে দেখলে, আমেরিকার বিদেশনীতি অথবা হাতিবাগানের হকার—হিন্দু স্কুলের বার্ষিক বিতর্কসভায় উঠে আসা যে কোনো বিষয়েই আমার অবাধ বিচরণ। এ হেন আমি, যে কিনা ক্লাসমেট ছেড়ে সিনিয়রদের সাথে উঠতে বসতে আর নিজেকে হিরো ভাবতেই বেশি অভ্যস্ত, এক অলৌকিক রবিবাসরীয় ভাত-ঘুম ভাঙা বিকেলে, ঘুম থেকে উঠে বেকুবের মতো বসে রইলাম। এ কি লেগে প্যান্টে ! হ্যাঁ, স্বপ্নে কিছু একটা ঘটছিল ঠিকই, এও ঠিক যে সেটা আর স্পষ্ট মনেও পড়ছে না তখন এবং সেই স্বপ্নের থেকে ঢের বেশি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্যান্টের দাগ, যাকে মাড় ছাড়া আর কিছুর সাথেই তুলনা করতে পারছি না, কিন্তু এদিকে বেশ বুঝতে পারছি এ দাগ সে দাগ নয়। সেই শুরু এবং শুরুর সে দিন শুধু নয়, বেশ কয়েক মাস, এ যন্ত্রণা চলল, রাত বিরেতে স্বপ্নলোকে অদ্ভুত সব রূপসীর আনাগোনা আর তারপর বাথরুমে ছোটা, প্যান্ট কাচতে। ক্রমে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে, একদিক এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেই ফেলি, এ থেকে মুক্তির কি উপায়। খুব খানিক খ্যাঁক খ্যাঁকের পর বলল, ‘‘হাত মার’’। সেটা কি ব্যাপার জানিনা বলাতে আরো একপ্রস্থ হাসাহাসি, ইতিমধ্যে আরো এক বন্ধু যোগ দিয়েছে টিফিনবেলায়। কৈশোরের গূঢ় রহস্য ক্রমে উন্মোচিত হল আর আমিও বুঝলাম, এতদিন কত না গালাগালি শিখেছি, কত না বিষয়ে কত ভারি ভারি কথা বলে ডিবেটে জিতেছি, কিন্তু জীবনের আসলি মাঠে আমায় দশ গোল মেরে বেরিয়ে গেছে হাজরা, দেবায়ু, দেবব্রত, রাজর্ষি—সব্বাই। সেই বন্ধুদের আর বলা হয়নি, ওরা বলে দেওয়ার পরেও বেশ কয়েকদিন লেগেছিল ‘হাতে কলমে’ ‘হাত মারা’ আয়ত্ত করতে।

প্রায়শই দেখি, নোবেলজয়ী থেকে ভাগ্যশ্রী বাম্পার-বিজেতা—সক্কলেই সুমন দে-রা জিজ্ঞেস

করেন, ''আপনার মতে আপনার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট কোনটা?'' আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমিও একদিন নোবেল ইগনোবেল অস্কার বা ম্যাগসাইসাই (নিদেন রাষ্ট্রপতি, সৃজিতও পেয়েছে) কিছু একটা পাব, সেদিন আমাকেও এই প্রশ্ন করা হবে আর পৃথিবী উলটে গেলেও এর উত্তর একটাই—''যেদিন প্রথম জানলাম স্বমেহন কি''। প্রকৃত প্রস্তাবে, অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব সিনেমার সাথে আমার পরিচয়ও স্বমেহনের 'হাত' ধরেই। মা স্কুলে, বাবা অফিসে, আমি বাড়িতে, একের পর এক সার্ফ করছি ইংরেজি সিনেমার চ্যানেল, খুঁজে চলেছি উত্তেজনার রসদ—তখনও বাড়িতে আসেনি ভিডিও প্লেয়ারের প্রশ্রয়, কম্পিউটার তো ভিনগ্রহের যন্ত্র। আর সার্ফ করতে করতেই কিছু সিনেমা পুরো দেখে ফেলেছি, হয়তো ভুলেই যাচ্ছি কেন টিভি খুলেছিলাম। এভাবেই জুলিয়া রবার্টস, এভাবেই ডার্টি ড্যান্সিং, এমনকী জি স্টুডিওর দৌলতে বার্গম্যান পর্যন্ত আর হ্যাঁ, অবশ্যই মনিকা বেলুচি। ম্যালেনা দেখে ছিলাম—আজও মনে আছে, মা বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি বাইরের ঘরে অঙ্ক করতে করতে টিভিতে চালিয়েছি ইংরেজি কেবল্ চ্যানেল। ম্যালেনা দিয়েছে, ইংরেজি সাবটাইটেল, তাই মিউট করেও দিব্যি বুঝতে পারছি চরিত্রেরা কি বলছে, আর অবশ্যই কি করছে। মনিকাই সেই প্রথম নারী—যাঁকে দেখেছি আমি। দেখছি আর অবাক হচ্ছি—অভিনয়ে মুগ্ধ হচ্ছি, উত্তেজিতও হচ্ছি বটে, কিন্তু বাথরুম যাওয়ার কোনো ইচ্ছা জাগছে না, কি অদ্ভুত সে টানাপোড়েন—প্রায় ন'বছর আগের সেই রাতের অভিঘাত আজও টাটকা। আজও আমি কিশোর রেনাতো যে জীবনের প্রথম (এবং সম্ভবত প্রত্যেক) যৌনসংগমে খুঁজে চলেছে ম্যালেনাকে—হ্যাঁ, আজও। যাই হোক, সে তো অন্য প্রসঙ্গ, অন্য রঙিন গল্প। স্বমেহন নিয়ে ব্যক্তিগত আরো দু'চার কথা আসবে হয়তো, কিন্তু তার আগে ফেরা যাক পাবলিক স্পেসে—ক্লাস নাইনের কিশোরকে পিছনে ফেলে চলুন আমরা হাঁটি রবীন্দ্রসদনের বাইরে দিয়ে, কোনো এক 'র‍্যান্ডম, যাইচ্ছে, ভাবনা লোফালুফি' সন্ধ্যেতে। ভাগ্য (অথবা দুর্ভাগ্য) যদি সঙ্গ দেয়, তাহলে দেখা পাব অদ্ভুত কিছু মানুষের, অফিস ফেরত, কাঁধে ব্যাগ, দাঁড়িয়ে আছেন বাসস্ট্যান্ডের পিছনের
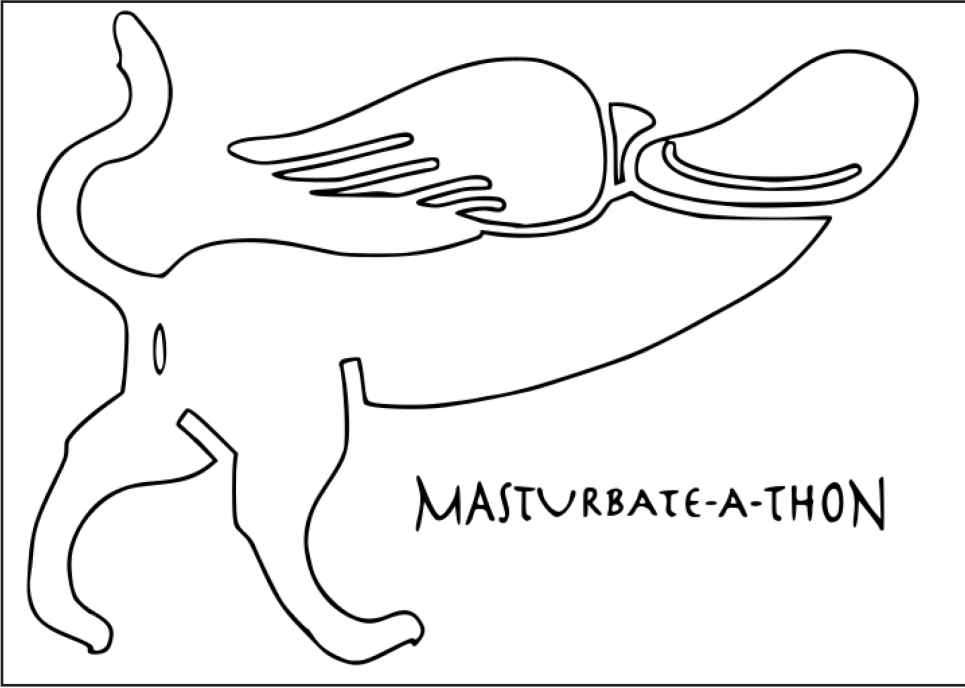
অন্ধকারে আর তাকিয়ে আছেন ভিতরের ঘাসে বসে থাকা গাছের আড়ালে চুম্বনরত প্রেমিক প্রেমিকার দিকে আর এদিকে হাত চলছে দ্রুতবেগে, প্যান্টের ভিতর। ছিটকে যাওয়ার কিছু নেই, যতই ধাক্কা লাগুক—ওঁরা আমাদেরই সহনাগরিক—কারোর না কারোর বাবা, দাদা, ভাই। না, এরা একেবারেই অপ্রকৃতিস্থ নন, একমুখ দাঁড়িগোঁফ বা অনেককালের কালো ছোপ ইত্যাদিও নেই, এক্কেবারে সাদামাটা 'সিভিলিয়ান'। অনেকদিনের ইচ্ছে, এমন মুহূর্তে হঠাৎ এঁদের ধাওয়া দিতে, দিইনি কখনও। এবার চলুন, ঢুকি ফেস্টিভালে—মেট্রো সিনেমা হল। সেদিন Tinto Brass-এর Mon Amour চলছে, আমার পাশের সিটে বেশ নড়াচড়া—অবাক হয়ে দেখি হাতের কাজ চলছে। সিট পালটেছিলাম সেদিন। কিছু বলিনি—আবারও, পরেরবার বলব বোধহয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি বলব? যে আমি, যে আমরা, সরব হই প্রকাশ্য চুম্বন এমনকি প্রকাশ্য যৌনতার অধিকার নিয়ে, তারা কি করে অস্বীকার করব যে আদতে স্বমেহন নিজের সাথে নিজের যৌনাচার, নিজেকে ভালোবাসার একমেবাদ্বিতীয়ম মাধ্যম? এ কথা প্রথম আমি বলছি না, উডি অ্যালেন বলেছেন, পাওলো কোয়েলহো বলেছেন, আরো অনেক দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্পী অনেকেই বলেছেন। প্রকাশ্যে নগ্নতার মতো প্রকাশ্যে স্বমেহনের অধিকার নিয়েও কি তবে সরব হওয়া যায়? যদি উত্তর হয় হ্যাঁ, তবে পালটা ভাবনা—স্বমেহনকালে যে কল্পজগতে মানুষ প্রবেশ করে, সেই দুনিয়ায় তো সে একা নয়, আরো কিছু বাস্তব চরিত্রের অস্তিত্ব রয়েছে সে পৃথিবীর আনাচে কানাচে (যেমন আমাদের রবীন্দ্রসদন বাসস্টপের পিছনের অফিসফেরতা বাবুদের ক্ষেত্রে)। তবে কি একে সম্পূর্ণতঃ ব্যক্তিগত বলা চলে? প্রসঙ্গত যদি ধরে নেওয়া হয় যে এই ধরনের 'লাইভ ভিসুয়াল'-এর বদলে প্রকাশ্যে স্বমেহনরত মানুষটির কল্পজগত তৈরি হচ্ছে 'রেকর্ডেড ভিসুয়াল'-এর মাধ্যমে (যেমনটা মেট্রো সিনেমা হলের ঘটনায়), তাহলেও কি চারপাশের মানুষের অস্বস্তিকে ইনভ্যালিড বলা যায়? প্রসঙ্গত সংসদে পর্ণোগ্রাফি দেখা প্রসঙ্গে লেখা একটি প্রতিবেদনে পড়েছিলাম এক সাংবাদিকের অভিজ্ঞতার কথা। রাত্রিবেলার শেষ লোকাল ট্রেনে বাড়ি ফেরার সময়ে একজন ভদ্রমহিলা দেখছেন যে তাঁর উলটোদিকের সিটে বসা ভদ্রলোক নিজের মোবাইলে নিবিড় মনোযোগে এমন কিছু দেখছেন যা তাঁর হাতকে চালনা করছে প্যান্টের ভিতরে। ভদ্রমহিলা সিট বদলান, পরের স্টেশনে কামরাও বদল করেন। এখানেই প্রশ্ন ভদ্রমহিলার মধ্যে সঞ্চারিত অস্বস্তি কি যৌক্তিক নয়? অতএব সরাসরি প্রকাশ্য চুম্বন, নগ্নতা বা যৌনতা নিয়ে কথা বলা একরকম, কিন্তু প্রকাশ্য স্বমেহনের প্রশ্নটা ঢের জটিল বইকি! এ প্রসঙ্গে পর্ণোগ্রাফির কথাও ওঠে। নিজের যাবতীয় কামনা-ফ্যান্টাসিকে লাগামছাড়া প্রশ্রয় দেওয়া যায় এক ও একমাত্র স্বমেহনকালে রচিত এক ভার্চুয়াল দুনিয়াতে যেখানে মানুষ পেরিয়ে যায় সমস্ত নীতি-পুলিশের আউটপোস্ট—অনেকক্ষেত্রেই

প্রায়শই দেখি, নোবেলজয়ী থেকে ভাগ্যশ্রী বাম্পার-বিজেতা—সক্কলেই সুমন দে-রা জিজ্ঞেস করেন, "আপনার মতে আপনার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট কোনটা?" আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমিও একদিন নোবেল ইগনোবেল অস্কার বা ম্যাগসাইসাই (নিদেন রাষ্ট্রপতি, সৃজিতও পেয়েছে) কিছু একটা পাব, সেদিন আমাকেও এই প্রশ্ন করা হবে আর পৃথিবী উলটে গেলেও এর উত্তর একটাই—"যেদিন প্রথম জানলাম স্বমেহন কি"। প্রকৃত প্রস্তাবে, অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব সিনেমার সাথে আমার পরিচয়ও স্বমেহনের 'হাত' ধরেই।

যেখানে মিলে মিশে থেকে যায় রেপ পর্ণ, চাইল্ড পর্ণ, অজাচার। অবশ্যই প্রশ্ন তোলা যায়, এ থেকে কি আমরা সংশ্লিষ্ট মানুষটির যৌনবিকার, মানসিকতা ইত্যাদির পরিচয় পাই না? কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তরও খুব ঘোলাটে। যে বা যাঁরা ঘরের ভিতর চাইল্ড পর্ণ দেখে উত্তেজিত হচ্ছেন, তারা যদি চার দেওয়ালের বাইরের জীবনে সম্পূর্ণ সুস্থ আচরণ করেন, তবে কি তাঁদের চাইল্ড পর্ণ দেখা নিয়ে আমাদের কিছু বলার থাকতে পারে? যদিও চাইল্ড পর্ণ বানানো নিয়ে থাকতে পারে, অবশ্যই। মোট কথা, স্বমেহনের আপাত সম্মোহনী দুনিয়া থেকে ওঠা প্রশ্নগুলো কিন্তু জরুরি। হয়তো সভ্যতার জন্য মরণ-বাঁচন কোনো প্রশ্ন নয়, কিন্তু ব্রেন ব্যায়ামের জন্যে, বিশেষতঃ স্বাধীন যৌনাচারের প্রকাশ্য সীমা কি, তা নির্ধারণের জন্য জরুরি তো বটেই।

অবশ্য একাধিক প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া দিয়ে কিছু যায় আাসে না, এ দুনিয়ারই পশ্চিম প্রান্তে দিব্যি চলছে 'মাস্টারবেটাথন'। প্রকাশ্যে স্বমেহন করে টাকা ওঠানো হয়, যৌনরোগ নিয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা গড়ে তুলতে আর এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে এই 'ইভেন্ট'টি জরুরি কারণ এটি 'Right to Masturbate'-এর পক্ষে একটি লড়াই। তাহলে নিশ্চিতভাবেই প্রশ্ন ওঠে, অধিকার নিশ্চয়ই খর্ব হয়েছিল কোথাও, কোনোকালে? প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র থেকে শুরু করে তুলনামূলক টাটকা খাজুরাহো, সর্বত্র স্বমেহনের সরব উপস্থিতি থাকলেও ইতিহাস বলছে, ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের ব্যক্তিগত যাপনে এত বেশি নাক গলাতে শুরু করে, একধরনের ক্ষোভের জন্ম হয়—অধিকার হারানোর অনুভূতি ঠিক সেখানেই তৈরি হয়। এবং কম-বেশি সব ধর্মেরই বক্তব্য একই সুরে বাঁধা, অর্থাৎ চরমপন্থী ও নরমপন্থী উভয় পক্ষের মতামতকে দুই দিয়ে ভাগ করতে যা পাওয়া যায় তা হল, ''অন্ততঃ বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপনের চাইতে স্বমেহন করা কম ক্ষতিকারক।" কিন্তু, এখানে ভেবে দেখার দরকার আছে, প্রতিবাদ ভালো, যতক্ষর না তা হয়ে ওঠে বাণিজ্যিক কূটনীতি, যেমনটা এক্ষেত্রে হচ্ছে, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে মাস্টারবেটাথনের উদ্যোক্তারা সেক্স-টয়ের রিটেল চেনের সাথে যুক্ত। আর তাই সেখানে অধিকার রক্ষার দোহাইটা খুব একটা ধোপে টেকে না। বরং উলটোদিকে হল্যান্ড, যা কিনা শরীর উদযাপনের মুক্তাঞ্চল হিসেবেই পরিচিত, সেখানে রয়েছে বেশ কিছু দোকানঘর—টাকার বিনিময়ে প্রাইভেট কেবিনে বসে পর্ণোগ্রাফিক ফিল্ম দেখতে দেখতে স্বমেহন করার সু-বন্দোবস্তও রয়েছে সেখানে। সেও তো এক অর্থে 'Right to Masturbate'কে সমর্থন করা—আপাতদৃষ্টিতে বাণিজ্যিক হলেও, তার অস্তিত্বটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত, গ্রনিংগেন শহরে একটি এরকম দোকানে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত সবাইকে ফ্রি-তে ঢুকতে দেওয়া হয়। আবার এই ধর্মীয় অনুশাসন আর স্বমেহনের প্রসঙ্গে মনে পড়বেই, 'Exorcist' ছবির তীব্র ব্যঙ্গের চাবুক—ক্রুশ দিয়ে স্বমেহন করে সতীচ্ছদ ছিন্ন করার একটি চরিত্র। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে বিভিন্ন ছবি, টিভি সিরিজ, বই, পেন্টিং, স্থাপত্য ইত্যাদিতে বারবার স্বমেহন ফিরে ফিরে এসেছে এবং তার ফিরিস্তি দেওয়ার চাইতে বরং এটা বোঝা জরুরি যে, স্বমেহনের তাৎপর্য্য এক একজন মানুষের এক এক রকম। আর তাই কিউ যেভাবে 'গান্ডু'তে স্বমেহনকে দেখ াবে, আর ফ্রেইডকিন যেভাবে দেখাবে, তার মধ্যে ফারাক থাকবে বইকি! সে ফারাক স্রেফ শ্রেণিগত, সময়গত ও ভৌগোলিক অবস্থান আলাদা হওয়ার দরুন নয়, ব্যক্তিগতভাবে, বাথরুমে, স্বমেহনকালে, স্বমেহন-কে তারা কীভাবে 'perceive' করেন, তাও একটা বড়ো ভূমিকা নেয়।

অর্থাৎ দিনের শেষে মানুষের নিজের সাথে নিজের কথোপকথনের, একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, স্বমেহন। এবং আরো মজার, সাধারণতঃ অধিকাংশ জিনিস নিয়ে লেখা সহজ কিন্তু করা কঠিন, স্বমেহনের অবস্থান কিন্তু সম্পূর্ণতই বিপ্রতীপ—বাস্তবে করা ঢের সহজ কিন্তু তা নিয়ে লিখতে গেলে ঘাম ছুটে যায়। অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে তেমনটাই ঘটল। তবে স্বস্তি আপাতত নটে গাছ এখানেই মুড়োলো। নীল ছবি হাতে করে বাথরুমে যাওয়া যাবে এবার—শান্তিতে, আহ। ■

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

আষাঢ় ১৪২২ ● জুলাই ২০১৫

৩. এক আণবিক হালুম   দীপক মজুমদার

তীব্র ঘৃণা প্রকাশের জন্য বাংলায় 'জানোয়ার' শব্দটির জুড়ি নেই। আংরেজি কেতায় 'বিউটি' আর 'বিস্ট' বা ফরাসি আদলে 'লা বেল এ ল বেত' তো মানবিক বর্বরতার আরও কয়েক ধাপ ওপরে। এরা সরাসরি সুন্দর ও কুৎসিত এই ধারণাদুটোকে 'নারী' ও 'পশু'র উপমায় মুখোমুখি দাঁড় করায়। পৃথিবীর সর্বত্র এভাবেই কি পশুকে উপহাস ও নিগৃহীত করার তাগিদে চিড়িয়াখানা-সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে? 'শিকার' থেকে 'খাঁচা' যে অসভ্যতর এ থেকে কি তারই প্রমাণ মেলে! শিকারে নিহত অনিন্দ্যসুন্দর পশুরাজের বুকের ওপর সদম্ভ পদরোপণের দৃশ্যে কোন্ পশুভাষা না-বলে উঠবে 'মনিষ্যি'?

তবু মানুষের আত্মপরিচয়-তৃষ্ণা তাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যায় তীর্থযাত্রার ছন্দে! দেশে-বিদেশে সর্বত্র দেখেছি এই দ্বৈতাদ্বৈতময় মানব-পশুর আলাপচারিতা। কাকাতুয়ার 'হ্যালো ডার্লিং' শুনে উল্লাসে ফেটে পড়ে নন্দীগ্রাম-আন্দুল-বালিগঞ্জের আবালবৃদ্ধবনিতা। পাখি ইংরেজি বলছে। শিম্পাজির মানুষী হাবভাব নিয়ে বা ডলফিনের উর্বশীপনা নিয়ে কী না উল্লাস আমাদের! মধ্য-আমেরিকার সেন্ট লুইস শহরের চিড়িয়াখানার একটি মেয়ে একবার আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। সে শিম্পাঞ্জি চত্বরে কাজ করত ওদের দেখাশোনার দায়িত্বে। আরেক বন্ধুর বাড়িতে তার সঙ্গে আলাপের প্রথম দিনেই সে আমাকে আমন্ত্রণ জানায় তার শিম্পাঞ্জি সংসার দেখতে যেতে। কলকাতার সল্টলেক এলাকার মত ছিমছাম মৃত রৈখিক কাঠামো। বিস্তৃত ও পরিচ্ছন্ন এক খাঁচার এই পূর্বপুরুষ বাসিন্দাটি লিণ্ডার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করছিল তা যে কোন নাগর-খেলোয়াড়কেই হার মানাবে। স্পষ্ট মধ্য মার্কিনি বাক্ ভঙ্গিমায় তাকে বলতে শুনেছিলাম, 'হাই, সুইটি হোয়্যার ওয়্যার ইউ ইয়েস্টার ডে?' শুনতে পাই যে শিম্পাঞ্জিরা নাকি মানুষের ভাষা শেখার কাজে খানিকটা এগিয়েছে। খৈরি-আদিখ্যেতার কল্যাণে আধুনিক (!) ভারতে বাঘে-মানুষে সত্যি সত্যিই এক ঘাটে জল খেতে চলেছে। বলা যায় এটা তাদের যৌথ প্রগতি অভিসার। পশুর সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতার যথাযথ ব্যাখ্যান মানস-ভাষাবিদরা করবেন, এবং করছেনও। মানবিক ভাষার আন্তর-আয়তনও মিলবে তার থেকে। বার্হেসের স্বপ্ন-শার্দুল, গাঙ্গেয় বদ্বীপের বড় গাজি খাঁ সেই গহিন অন্তর্লীন ভাষার ছায়া পুরোগামী। পোল্যাণ্ডের ভারশাভা (ওয়ারশ) শহরের চিড়িয়াখানায় এবংবিধ এক ভাষা-উদ্ভাসের গল্প বলি।

১৯৮০ সালের জুনের এক দুপুরে হাজির হয়েছিলাম ওই চিড়িয়াখানায়। সঙ্গী ছিলেন বোম্বাইয়ের বিদ্রোহী ছবি 'টুয়েন্টি সেভেন ডাউন'-এর প্রতিভা-তীক্ষ্ণ অভিনেত্রী রেখা সবনিস ও বাংলার আর্ত-অনাথ বাউল, গৌর খ্যাপা। বিশ্বখ্যাত নট-দার্শনিক জের্সি গ্রোটাভস্কির 'থিয়েটার অফ সোর্সেস' বা আদি, জৈবিক নাট্যশাস্ত্র প্রসঙ্গে একটি ওয়ার্কশপ-এ এক সপ্তাহ কাটিয়ে আমরা ভারশাভায় ফিরেছি। তারই রেশ বয়ে একদিন দুপুরে এসেছি এই চিড়িয়াখানায়। গভীর জঙ্গলে রাত-বিরেতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দৌড়ে, শুয়ে, বসে, নানা কর্মকাণ্ড করে ইতিমধ্যে আমরা আক্ষরিক শুদ্ধতায় অনেকটাই জংলি তখন। বাঘের সারির সামনে গিয়ে দেখি ওদের খাওয়ানো হচ্ছে। পোলিশ গাইড লাইভকে আমরা তক্ষুণি অনুরোধ করলাম ভেতরে ঢুকে বাঘের ভোজনটা দেখতে চেয়ে। অনুমতি পাওয়া গেল ব্যাঘ্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাঁর হাতে তাঁর কাছ থেকে। বাঘ ব্লকের ভেতরে ঢুকে হাঁটতে হাঁটতে এক নধরকান্ত খাঁটি সুন্দরবনী বড় গাজি খাঁর খাঁচার সামনে আমরা দাঁড়িয়েছি চিত্রবিদ্ধ। কী তার প্রোফাইল। যেন পটে আঁকা সাক্ষাৎ গাজি। উত্তেজনায় শিহরণে ঝড় হয় উঠেছি তিনজনেই। গরাদের দুপাশ নিয়ে আমাদের দূরত্ব বড় জোর দু-মিটার। সাধারণ দর্শকরা উল্টোদিকে অন্তত পাঁচ মিটার দূরত্বে থাকে। আমরা বিশেষ সুযোগ পেয়েছি এই অন্তরঙ্গতার। ব্যাঘ্রাচার্যের মুখে ক্ষুৎকাতরতার লেশমাত্র প্রকাশ নেই। বরং বামাখ্যাপার সরল প্রশান্তিই টলটল করছে চোখে। গ্রহচ্যুত ত্রয়ী সম্মোহনস্তব্ধ এই বন্ধুর সামনে ভেসে উড়ে যাচ্ছে। আচম্বিতে ভূমিকম্প হল। এই ভরগ্রস্ত আবেশ ছিঁড়ে তীক্ষ্ণ উঁচু পর্দায় কেন যে গৌর ওর খমকে টান মেরে উঠল জানি না। সঙ্গে সঙ্গে এক আণবিক হালুম ছেড়ে বড় গাজি খাঁ সামনের দু-পা উঁচিয়ে মুখ তুলতেই আমরা ছিটকে পড়লাম তিন মিটার পেছনে। দুই বাঙালির নিজের ভাষায় আলাপ এমন অস্তিত্বময় ভাষায় আর কখনো শুনিনি।

৪. রাত্রি চতুর্দশী   পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
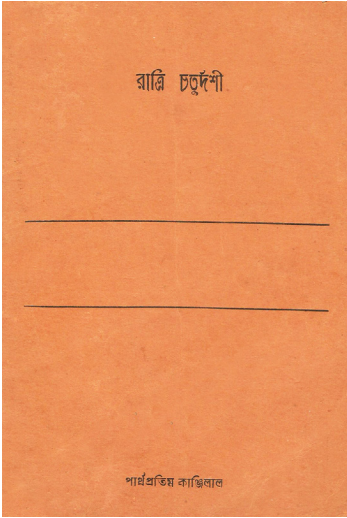
তারালেখা

আছি ঘুমে, স্বপ্নে মূর্তি দেখা দেয়, বলে
জলের ভিতরে ডুব দিতে, ডুবজলে
সে রয়েছে। দুহাত নাড়িয়ে তাকে বলি
আমিও রয়েছি ঘুমে, কাক-অন্তর্জলী
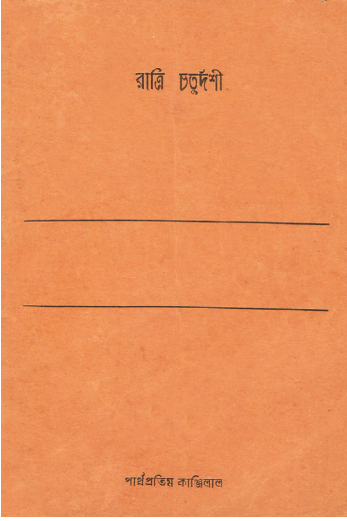
আমারও হয়েছে মনে হয়, সে বরং
পারে তো আসুক নিজে; কিছু পথশ্রম
আরো হবে, তবু জলে সে-ই তো অধীরা।
আমার ঘুমের ফুটপাথের শনিরা

অপরাজিতার ধ্রুব উপমায় রাখা,
আর রক্তজবা গণরাজের পতাকা;
খরা, বন্যা, খরশীত এখানে নিয়ত
পা ছোঁড়ে, প্রলাপ বলে, আর আমিও তো

আছি ঘুমে।—কিন্তু মূর্তি দেখা দেয়, বলে
ডুব দিতে, সে রয়েছে উপরের জলে।
৪.১.৮৩
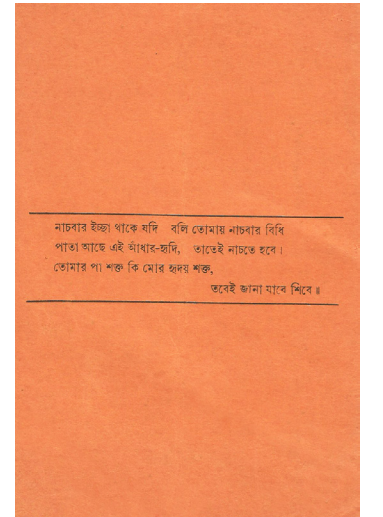
এলে জি ঃ পশ্চিমবঙ্গ

ছিলেন বঙ্কিমবাবু, ছিলেন রোহিণী,
ছিলো আমবন আর প্রশস্ত দীঘিকা,
বনমন্দিরের মধ্যে, ষোড়শীকালিকা।

আমবন কাটা গেছে, ভেঙেছে মন্দির,
বঙ্কিমের পক্ষে তাঁর নামের কারণে
ন্যায় ও সত্যের দিকে যাওয়া অনুচিত
হয়েছিল জানা গেছে, রোহিণী নিশ্চিত
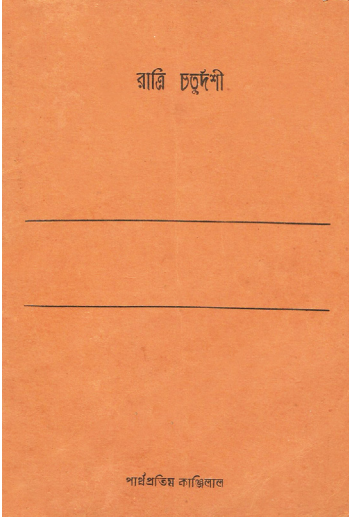
কোনোখানে নেই, আজ সমস্ত প্রাকৃত।
দীর্ঘিকা বদ্‌লে তাই থেকে গেছে দিহি
পোড়া মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে

ন্যাড়ামাথা কালী, যার জিভটিও কালো,
দিহিতে কচুরিপানা দৃঢ় সংগঠনে
প্রবল জটিল—দিহি থেকে ওঠে তাপ—
ফাঁকা আমবনমাঠে আনমনা সাপ।
৫.৬.৮২

সমুদ্রহোটেল

কতদিন পড়ে আছি   এখানে, রাতুল
দৈবের প্রবাসবশে,   সিমেন্ট রঙের
সমুদ্রের ধারে প'ড়ে   একাকী, আলুল . . .
ভিতরে নির্জন শ্বাস   ঝাউয়ের বনের।

ভাঙা পিলারের কাছে   ভেঙে পড়ে জল।
হাওয়া তাকে পাঠিয়েছে,   নিয়ম-অধীনা
জলে ভেজা পিলারের   পিচ্ছিলচঞ্চল
শ্যাওলা ছড়িয়ে গেছে   নির্বোধনবীণা।

কখনো বালির 'পরে   দেখি নীলফুল।
বিবাহ সম্ভব, ভেবে   নেয় বন্যপ্রাণ;
সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ রেখে   যায় উর্মিকূল,
সেই শঙ্খে আমিষের,   লবণের ঘ্রাণ।
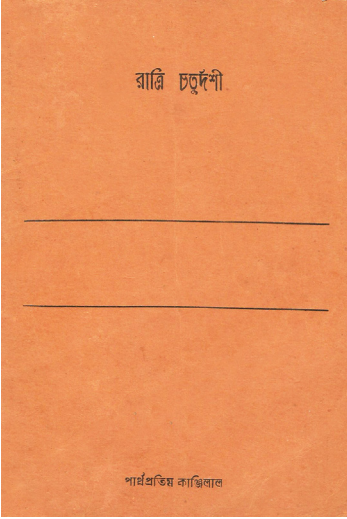
উরুদেশে চন্দ্র নিয়ে   জীবতারা নাচে।
এখনো জ্বলছে স্টোভ,   জানাই পিশাচে।
২২.১.৮৩
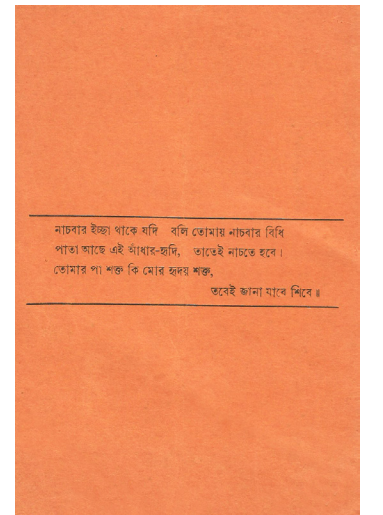
ট্রেন

যশোর, সবুজ ট্রেন, তুমি কি এখন
অন্য কোনো বালকের মর্মে এসে পড়ো?
যখের গহনা আগলায় আজ এই
উত্তর-বালক, জড়-স্মৃতি করে জড়ো
অপারগ আচার্যের আঙুলে উন্মন
উপবীত যেন, যার ব্যবহার নেই।

শৈশব, সবুজ ট্রেন, ট্রেনের সতত
শৈলজল অগ্নিশব্দ, তমসাজীবিতা . . .
যত্নে স্বচ্ছ হলো আজ, তবু পথ-ক্ষত
যশোরেশ্বরীর ভূমে শয়ান কবিতা
আমাকে জানায় কীর্তিনাশা-দূরদেশে
আর্ত পারাপার আজো। ইন্দ্রিয়ঙ্কুল

অতীতে। সবুজ ট্রেন, তরুর অমূল
অন্য বালকের ঘুমে, চুলে ওঠে ভেসে।
৯.১.৮৩
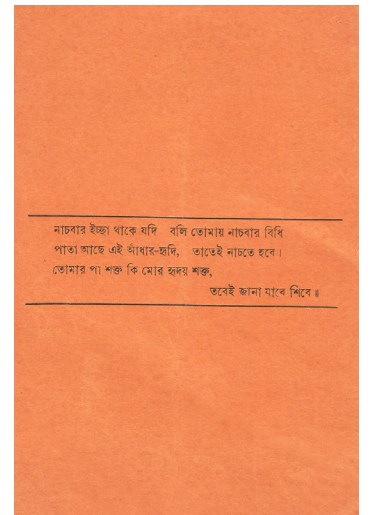
সাগরে

হৃদয়ে ডোবার খল
হৃদসর্বস্বের আরো
বলে, 'বসন গিয়েছে,
বলাৎকারের ধোঁয়া
মজার সৎকার হবে,
ম্যাজিক নিশ্চয় হবে
পাবকের 'পরে, ঠিক
পা যাতে না পুড়ে যায়

শব্দে অভিপ্রায়
কাছে যেতে চায়,
যাক, দেহে আছে;
—আগুনের আঁচে
হবে ছায়ারাস,
যদি হেঁটে যাস
নিয়ম লাগিয়ে,
আগুন জাগিয়ে।

যদি ভুল হয়, জানবি
যখন যেমন। অর্থ,
পৌরুষ নিতম্ব চায়,
প্রৌঢ়সফলতাগুলি
অন্তরে সাগর পাতা,
অভাগা হয়েও ফের

লক্ষ্যই আগুন—
নিয়ম নির্গুণ।
বিদ্যুতেরা মেঘ;
চায় যুবামেধ—'
তাই অভিপ্রায়
সমুদ্রেই যায়।

২৫.৩.৮২

নাচবার ইচ্ছা থাকে যদি   বলি তোমায় নাচবার বিধি
পাতা আছে এই আঁধার-হৃদি,   তাতেই নাচতে হবে।
তোমার পা শক্ত কি মোর হৃদয় শক্ত,
তবেই জানা যাবে শিবে॥

সম্রাট

গোপন ভারতবর্ষ, আমাকেও চাও—
গোঁয়ার জোয়ান খোট্টা হতে বলে যাও
উপদেশ দাও তুমি লোহাচুর খেতে
উড়ে হতে আজ্ঞা কারো, আজ্ঞা করো যেতে
পশুশ্রমিকের দলে, রিরংসা-নির্বেদে
পরমতাগুলি সব ভাগ করে নিতে
কেবল তাদেরই সঙ্গে অতি অতর্কিতে,—

কেননা তোমার যুক্তি থাকে তর্কাতীত।
অমি তা করেছি, দেশ, ঈশ্বর ব্যতীত
আর সব কৌতূহল মূলে ভূপাতিত
হয়ে গেছে, সেই সব মরা গাছ কাঠ
হবে রান্নার আগুনে— আগুন, আকাট
সত্য, এই জেনে। আজ বিদেশের দিকে
সব প্রশ্ন উড়ে যায় লঘু হতে শিখে।

৩.৪.৮২
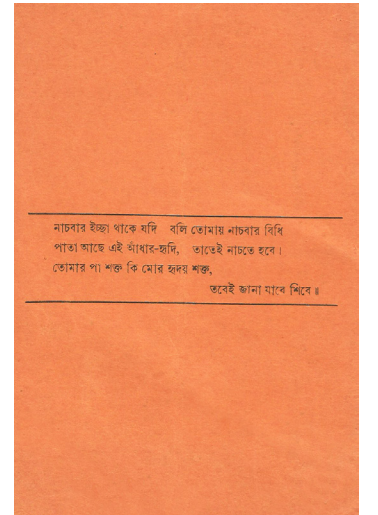
স্বর্ণসন্ধান

বাঁকা জিভে হাসে সোনা, পাশে জ্বলে ধূপ ঃ
'ভাবছো, এড়িয়ে চলে যাবে? বিশ্বরূপ
এইখানে খোলা আছে আমার অক্ষরে
এ-জন্মের নামটিকে কল্পনার পরে

দেখা যাবে তুমি ছোটো করেছো সততা
দেরি না ঘটিয়ে। ইচ্ছাপূরণের কথা
লিপিভুক্ত করে যাচ্ছো। এবং সে লিপি
লিপ্সাতুর নখে টিপছে বইয়ের পৃথিবী।'

তেল তার সমর্থনে ধোঁয়ার বিস্ফারে
তেজের প্রমাণ দিতে তথ্যের আছাড়ে
ঘরবাড়ি পাল্টে দেয়; খাদের কিনারে
ঘটনাপ্রবাহ আর সাংবাদিক বাড়ে।

যদিও এদেরই মধ্যে, রোগা ও আদুড়
যখ্ হয়ে আছি, সোনা, অদ্যপি ধাতুর
১৩.১.৮৩
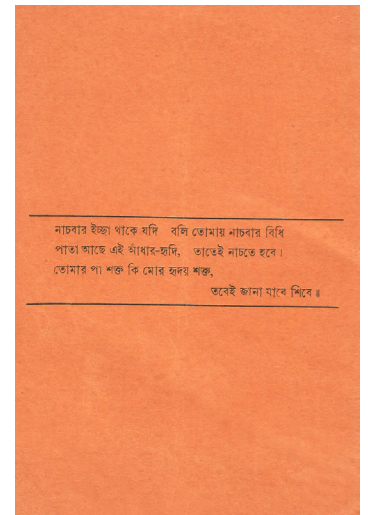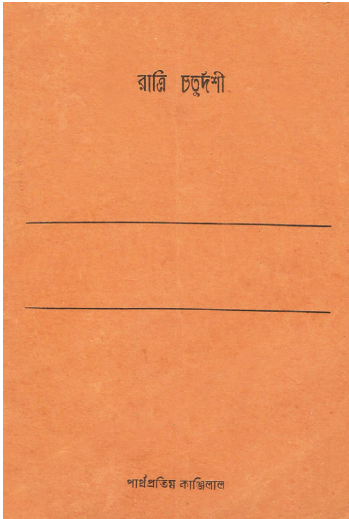
রুদ্রপুরুষ

রূপকথা শুনবে ব'লে, নাতিনাতনীরা
বুড়ি ঠাকুমার কোল ঘেঁষে আছে বসে;
রাত্রি হাসে, দশনে কৌমুদী, মাঠে মাঠে
রাত্রি, হাসে বন্ধকীর বুকের কবাটে . . .

কোন্ গল্প তোরা শুনলি, আবোধ পাখিরা?
রাজপুত্র-রাজকন্যা, দানবে-রাক্ষসে
তোদের নতুন ঘুমে জ্যোৎস্না দিয়ে যাক;
যে আমাকে বলে চলে, কথা চেপে রাখ্

তোর জানা মিশিয়ে দে বাদুড়ের ভিড়ে—
অন্ধ বুড়ো মিশিয়ে দে নাভির নিবিড়ে—
তুই তো জানিস, রাজপুত্রই রাক্ষস
আর রূপকথার কুমারী? আফশোষ্

রাখিস না—সে রাক্ষসী, আছে তার জ্ঞান;
পিতৃগণ পরে আসে, প্রবীণ সন্তান।
২০.১.৭৭
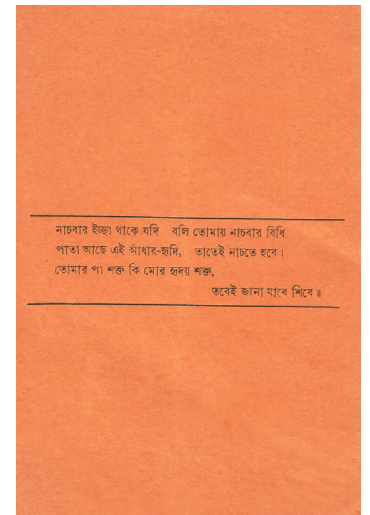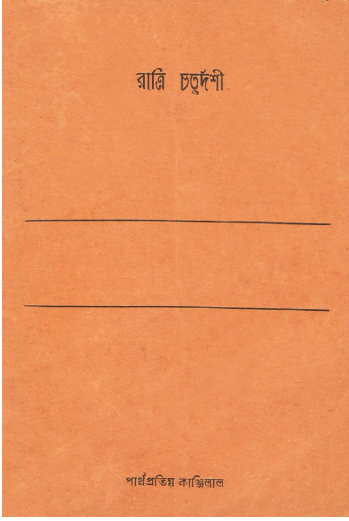
স্কেল

স্কেলের শৈশব জানে বয়ঃসন্ধি, স্কুল,
পাঠ্যবিষয়ের দ্রুত গম্ভীর কঠিন
হয়ে-ওঠা—সে-ই শুরু হলো প্রশাসন,
প্রতিযোগিতার হ্রেষা, বয়স্কের ঋণ—

যার হাতে থেকে ওঠে পড়ে, সে-ই প্রভু
যার হাতে না-থেকে এমন, সে-ই দাস!
যার লঘু নরম নিতম্বে ওঠে-পড়ে
স্কেল, সে নিশ্চয় শিষ্য আরো কিছু মাস

তাকে বলা হচ্ছে ঃ স্পঞ্জ, ঠিক উল্টো দিকে
গুরু ও কঠিন স্কেল, সীমা, যা কম্পাস

তাকে জানো। ঐ চলে গেলো বাল্যকাল
করতল, মন, চোখ, পিঠ হবে লাল
স্কেলের ঘূর্ণনময় চটাসে, নীরবে—
জ্যামিতির খেলা এই। এই হতে হবে।
২১.৮.৮২
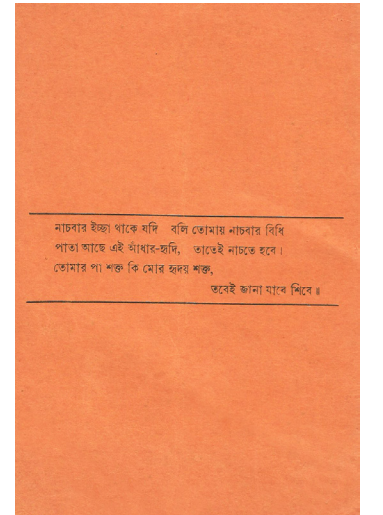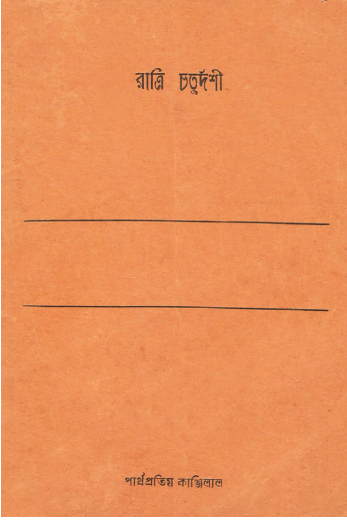
আকাশরথ

মুহূর্তের মেঘে ভ'রে থাকে সব কিছু
এমন কি শহরের পোড়া দিনমান-ও।
তবু যে কখন, আল্লা, চোখ চলে যায়
উঁচুতে, অথচ জানি ওপর বা নীচু
নেই, সবই পাশাপাশি, আকাশ-ও পাশেই।
তাকিয়ে দেখছি, কই, নীলিমা তো নেই
কিংবা নির্বিকার নীল নীলেই মাখানো
সংবাদপত্রের মতো রোদে গলে যায়।
আজ অকপটে বলি, সুবিধানবাদী
আমরা দেখছি শুধু ক্ষুন্নিবারণে
বেলা যায়, বিষয়ের প্রভৃতি-ইত্যাদি
হয়ে বেঁচে আছি, ধরো, প্রায় অকারণে।
মেঘের মুহূর্তে যদি কিছুটা সময়
পাওয়া যেতো . . . হয়তো, মেঘ একমত নয়!
২৮.৬.৮২

স্পর্ধা
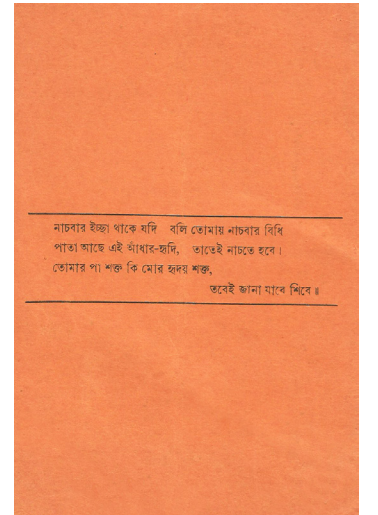
বর্জাইস, তুমি রাখো অভিনিবেশের
উৎসশীর্ষ, উত্তরশিখর। অন্ধতার
বর্জনীয় বিন্দু থেকে স'রে আনো স্মের-
উৎপলকপাল, হাতমালা, গ্রন্থনার
ধার্য করো। তুমি চাও অণিমাপরমে
কোনো কারণকবিতা, প্রকাশের কূট
ধাবমান হুতাশনে অক্ষকরপুট—
কম্পোজিটরের কামী তীক্ষ্ণচোখ শ্রমে।
চোখেরই সামনে তুমি নিহিত গুহায়।
শক্তির বিনয় দেখে, মোটা হরফেরা
চম্‌কে পাংশু হয়ে নানা অসূয়ায়
শলাপরামর্শ করে, কচাল, বখেড়া,

বিজ্ঞাপন ধ্যেয় জেনে বিদ্রূপের জোটে
বিবৃতি ছড়ায়। তুমি আছো ফুটনোটে।
২২.১.৮৩
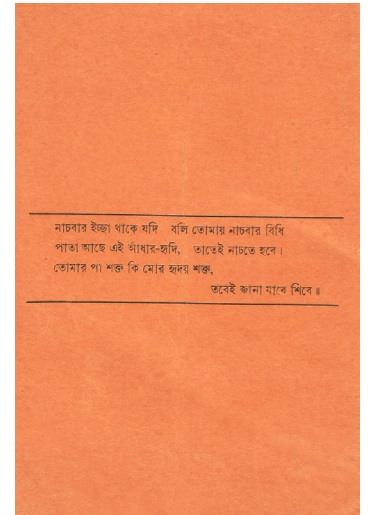
কন্দর্প

তখন ছিলেন নববস্ত্রের যৌবন,
লোকযাত্রা চেয়েছিল ইন্দ্রিয় জাগুক,
তরুছায়ে কাঁচাকন্যা, মায়াফলরঙ্,
লঘুজলমেঘ ছিলো আচমনোন্মুখ।

নশ্বরতা কিন্তু ছিলো। তার উৎপাটন-
বিষয়ে, অতীতে কিছু ভাবিনি বিশেষ;
নগ্নতাচূড়ান্তে তার ধীরপ্রশাসন
বিন্দুবিন্দু বিষে রাখে বুদ্বুদনিমেষ।

গলন্ত মাথার ঘিলু রাখি যৌনবীজে,
সন্তপ্তসাহসে ক্রুদ্ধ, মত্ত, রক্তত্বক,
সমভঙ্গ হতে আর পারবো না নিজে,
গতাসুকে বলি ঃ তুমি তাপের নির্মোক।

বাধা যে আমার, তার এই বিবরণ ঃ
বাঞ্ছাতরুতলে কন্যা, হৃচ্ছায়াবরণ।
২৮.১.৮৩
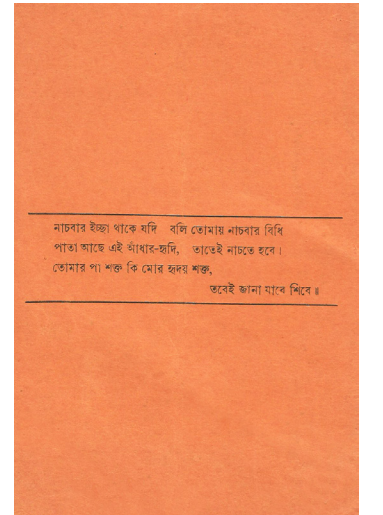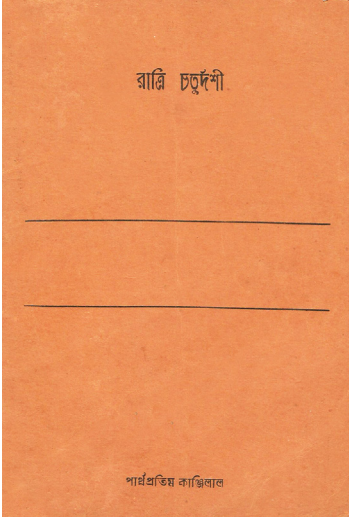
বিগ্রহ

জঞ্জালের পাশে গঙ্গা
ক'রে দিয়ে পড়ে আছে;
জঙ্গমতাবশে, অল্প।
কোণ জঞ্জালের মধ্যে,

নিয়ে অনুমান করি ঃ
বস্তুনিচয়ের—এই
নিশ্চিতই তার মনে
কেননা কাছেই ধোঁয়া
কেন্দ্রীভূত মড়া আর,
বড়ো হতে থাকে রসে,

জঞ্জালঘাটের গঙ্গা
গ্রাস মেলে পড়ে আছে,
জড়ানো বিগ্রহমূর্তি—
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে
২৭.১.৮৩

চিদ্ধর্ম উপুড়
ফুলছে জঞ্জাল
কাকের বাহুর
এই চিত্রচাল

কাক খোঁজে পাল
সংগ্রহপৃথিবী
হয়েছে জাহাজ;
ওঠে নাজেহাল,
জিলিপির ঢিবি
তাপে, জাঁহাবাজ।

চিদ্ধর্ম-উপুড়
ভাসে খড়-চাল-
কাক দেখে দূর
চলেছে শৃগাল।
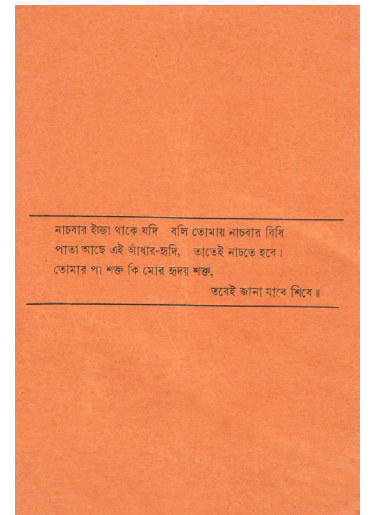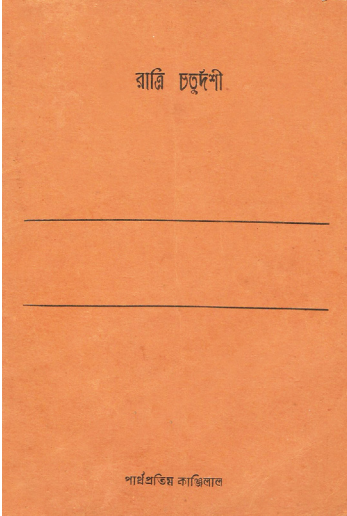
রাত্রি চতুর্দশী

নিশির গ্রহণে-দেখা পূর্ণনষ্টা সবুজ ডাবের
অজগর পুরোহিত ব্লেড ঘষে বুকে। দুরাসদ

মাংসের মীমাংসা, সারিবন্দী শনি, পাশে প্রস্রাবের
জলজল, সর্পপ্রজ্ঞা, গোমেদরঙের কাঁচমদ
চন্দ্রকান্ত চরসের ধূম, ঘুম ভৈরবীনাভির

আজ্ঞা, আজ্ঞা। ঈশ্বর, তোমাকে জানি মলমূত্রবৎ।
বিপরীতপ্রসূতিসদনে, বাচ্চার চিতার কাছে
রূপোর খাঁড়ারা ওঠে, গর্ভগর্ত, নড়ে জিহ্মজিভ,
উরুব্যাদানের পল্লী, কঁহি ধুঁয়া য়ঁহা নাচেনাচে

আউয়া আউয়া। জুয়া খেলে যোনিগুহাসর্পশিব,
প্রচেত হাউই বলে ঃ আমার বাপের সঙ্গে শো, মা।
সঙ্গমনর্তিত নিতম্বের চন্দ্রহারের সুষমা
ব্রহ্মবাহিনীর জলে, চক্রে প্রণবচতুর। দোষী
হিম, শব নেই। অগ্নি, কবি আছে। রাত্রি চতুর্দশী। ■
৮ ও ৯.৩.৮৩

রাত্রি চতুর্দশী/ সনেট সংগ্রহ/ ১৯৮৩
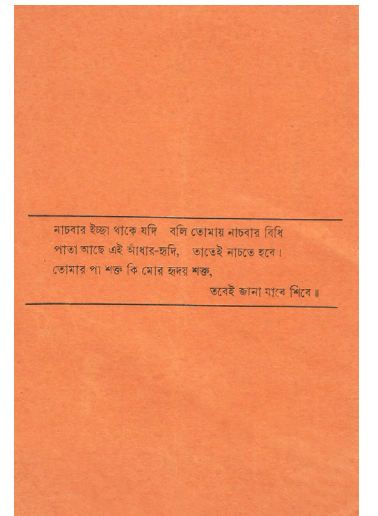
৫. তুষার রায়ের কবিতা

কালো মলাটে ঢাকা যে কবিতাগুলি তুষার আমাকে দিয়েছিলেন সেই কবিতাগুলিই এখানে আছে। বানান ও যতিচিহ্ন যা ছিল তাই মোটামুটি রক্ষিত হল। কোনো কবিতায়ই কোনো রকম তারিখ, সময় ও স্থানের উল্লেখ নেই। মোট কবিতার সংখ্যা একশ ছয় ছোট বড় মিলিয়ে। কিছু কবিতায় শিরোনাম ছিল না।

—অজয় নাগ

অপ্রকাশিত তুষার (১৯৮৮)

ছবি, জানালায়

সমস্ত গ্রাম পাড়া ঘুমিয়ে আছে জ্যোৎস্নায়
চন্দ্রালোকে মাঠ পাহাড় ঘুমিয়ে পড়েছে।
আমি এইমাত্র জেগে উঠে জানলার বাইরের এই
প্রসারিত শান্ত সফ্‌ট দৃশ্য দেখলাম

সমস্যা সন্তাপ ক্লেদ লেদ মেশিন লদলদে জেলীফিশ্‌
মনে পড়ল না
পৃথিবীর আরো কতো লোভ ক্ষোভ অবক্ষয়
মনে পড়ল না
শুধু এই শান্ত সফ্‌ট চান্দ্ররাত হাওয়া দূর
নক্ষত্রের নক্ষত্রলোকের থেকে
সাংগীতিক ওয়েভকে ধরে
এইখানে একটুকরো জানলা না ক্যানভাসে
এই গাঢ় শান্ত সফ্‌ট ছবি।

বেলা, মেলা, খেলা

রক্তেরর ভিতরে কিছু অসম্ভব খেলা হয়
সেইখানে স্বপ্নে ঘুমে জাগরণে খেলি
তাতেই তো ভেলা ভাসে তাতেই তো বেলা হয়
যথাযথতায় আমি পৌঁছতে পারিনা বেলাবেলি

ছবি: সম্বরণ দাস
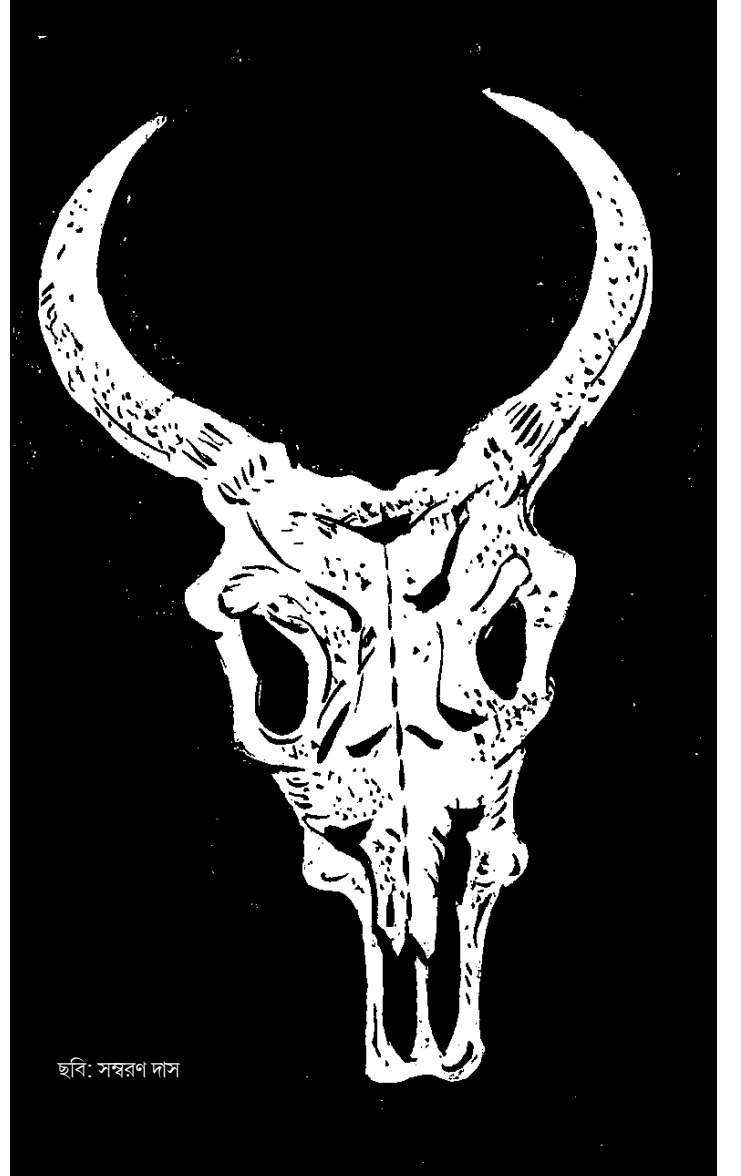
শিশিরের ঝরাপথে চাঁদ জেগে ছিলো
একথা ভাবতে রাত কবিতায় গাঢ় বাজে
তারা সমস্বরে গান গায় যারা রেগেছিলো
সেই ধর্মঘট ভেঙে শ্রমিকেরা যায় কাজে

গূঢ় কিছু ফিশফাশ চিৎকার করে
চাঁদে গোলা জল খায় রাতের হরিণযূথে
বাথটবে অলক্ষ্যে অনায়াস জল ওঠে ভরে
কাকে সে খবর দিতে ছুটি টেলিফোন বুথে

কে যেন প্রত্যেক ভোরে প্রশ্ন করে তাকে পেলি?
পাইনিতো, প্রত্যেক ঝুলনে তবু মেলা হয়
জ্যোৎস্নায় আমি, কুকুর ছানার সঙ্গে খেলি
রক্তের গভীরে ভেলা ভেসে যায়, বেলা হয়।

দুঃখের অভাবে

একদিন আনন্দের কাছাকাছি গিয়ে
দুঃখের অভাবে ফিরে আসা
সেই ভালোবাসা, তুমি
নিয়েছো ফিরিয়ে
তুমি যা দিয়েছো তার অভিমান এই
এই তার মূল্য ধরে—আমি নই জেনো
আমি শুধু ভালোবাসা দিয়ে
অপমান কিনে ফিরে আসি

ফিরে যাই কারণবিহীন দূর টিটলাগড়ের দিকে
ফিরে আসি কেয়াতলা রোড ধরে
মার্লিন পার্কের কাছে—যে কোনো নারীর মধ্যে তুমি
যে কোনো কুকুর তুমি ভালোবাসো
যে কোনো মানুষ

যে কোনো ফানুস আমি ওড়াতেই চাই,
কেননা শূন্যমনে তারপর ফিরে আসা যায়।

চারিপাশে সমুদ্র

দূর সমুদ্র সফরে ফিরে, দেখা পাওয়া
নারী মতন মেয়ে
স্বপ্নের সসাগরা রাণীর মতন গ্রীবা শরীর
অথবা পরীর মতন যেন চুর্ণছুটে নেমে যাবে
উশ্রীর চাঁদে গোলা জলে

আমি তো হরিণ নয়, টেরিলীন পরা বাঘ
না না বাঘ নয় হাতি কিংবা মশা নই
বাঘে সাপে মেশা মুখ এই
আকামা রাফ্ গালে চুমু খেতে শ্রীলতার ঠোঁটে
রক্ত আসে। শ্রীলতা, মনিকা
এবং অন্যান্য আরো মেয়ে
রেডিওর বিশ্রী বিজ্ঞাপনে
উশ্রীর মতন পায়োরিয়া সারানোর
পেস্ট-এর গান গায়

আসলে অনীতা আমরা অথৈ সমুদ্রে ভাসা
লাল হলুদ বয়া, সমুদ্র
চারপাশে সারকারামায় সমুদ্র-সমুদ্র-মুদ্রস
দ্রমুস-সমুদ্র চারি পাশ ঘিরে।

আনুপুঙ্খ

আমি আর আনুপুঙ্খে যেতে চাইনা ইদানীং
আমি একটু স্বাদ ও সম্পৃক্তির মধ্যবর্তী শর্টওয়েভে
কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রাতিগ মূর্তি থেকে বিমূর্তনে
এই নীল লাল ও হলুদ তাপ সংবাহনে
পরম্পরা নিয়তই ভেঙে ভেঙে ত্রিডবল
ছয়গুণ, বারো ও চব্বিশ থেকে লাফ
দিতে ক্রমশই
আরোহাবরোহণের নঙর্থক হৃদি
যদিদং হৃদয়ং বলতে ফেটে যাব
লাল নীল হলুদের থেকে ইনফ্রারেডে
এ কথায় কেমনে বোঝানো গেল সেই
রাগতঃ সংশ্লেষ
এই ট্রেন থেকে আমি অতএব নেমে
চলে যাব বনান্তরে—ক্রমশঃ গভীর ওই বনে
গিয়ে ওই বাঘিনীর রোমশ শরীর
মেখে শোবো। ■
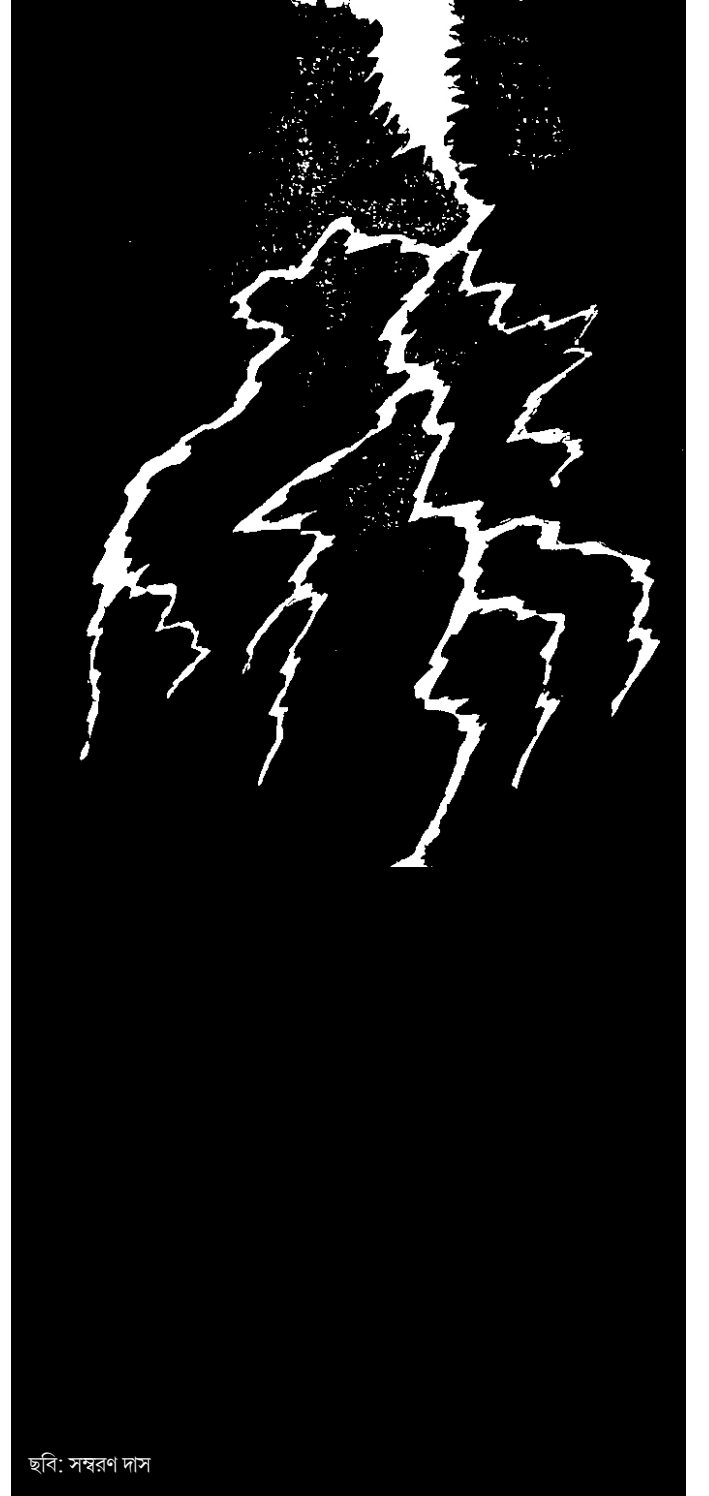
ছবি: সম্বরণ দাস

তুষার রায়ের ১০৬ টি কবিতাই এখানে প্রকাশিত হবে।

৬. পক্ষে-বিপক্ষে নবারুণ ভট্টাচার্য

একটি ঐতিহাসিক অভিযোগের বয়ানটি ছিল—

'রাষ্ট্র-স্বীকৃত ঠাকুরদেবতাদের না স্বীকার করা এবং অন্যান্য নতুন দেবতাদের অধিষ্ঠিত করানোর অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধী। সে তরুণদের মন বিষিয়ে দেওয়ার অপরাধেও দোষী। এর দণ্ড হিসেবে মৃত্যুই কাম্য।'
৫০০ জন বিচারক ছিল।
মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে দাঁড়ায় ৩৬১ জন।
মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে ভোট পড়ে ১৩৯।
সক্রেটিসকে হেমলক পান করতে হয়েছিল।
সংখ্যাধিক্য সবসময় সত্যের পক্ষে, মানবিকতার পক্ষে যায় না। বিষয়টি আমরা মানুষের material-practice ও practical-spiritual—মার্কস কথিত মানুষের দ্বিবিধ উদ্যোগের ক্ষেত্রেই ভেবে দেখতে পারি।

জুলাই ২০০৯

৬. একটা মাত্র বালির দানা নবারুণ ভট্টাচার্য

আধুনিক পদার্থবিদ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার ক্ষেত্র হল edge of chaos যেখানে বহু ব্যবস্থা, আমাদের জানা ও অজানা, পৌঁছে যায়। বালির ঢিবি তৈরি করতে করতে এমন একটা সঙিন পরিস্থিতিতে পৌঁছয় যখন একটা মাত্র বালির দানা যোগ করলেই ধস নামতে শুরু করবে, অবধারিতভাবে। ওই একটি জানা সংযোজনের বিন্দুটি order ও chaos-এর মধ্যে এক জায়মান অবস্থা। পদার্থবিদ্যার এই চিত্তাকর্ষক বিষয়টি কী সাহিত্য পাঠ ও সমালোচনায় আনা যায়? যে কোনো লিখে ফেলা রচনাই একটা ব্যবস্থা। সেখানে ওই একটা বালির দানা কি পাঠকের অনুধাবনের রশ্মি যা একটা রদবদল ঘটায়—একটা chaos-এর সন্ধানে, একটা তোলপাড় খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে? নেতিবাচক দৃষ্টি নিয়ে chaos নাও দেখা যেতে পারে। খুব স্পষ্ট করে ব্যাপারটা বোঝানো হয়তো গেল না, এই অপারগতা থেকে গেল। কিন্তু ভাবনাটি ঘিরে কিছু চিন্তা কি কেলাসিত হতে পারে? অনেক স্থিতিশীল ব্যবস্থাই অবধারিত বিস্ফোরণের দিকে, অনিত্যের দিকে হেলে পড়ে। এই দৃষ্টিতে অবশ্য সেই রচনাগুলিই দেখা যেতে পারে যেগুলি আলোড়ন ফেলে দেয় বা বলা যায়, যে সব লেখা আচমকা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। হয়তো পুরো ভাবনাটাই স্রেফ আবোল তাবোল! ■

মে ২০০৯

৭. পমি আয়নায় অরুনেশ ঘোষ

সঙ্গমের প্রায় শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ শুক্রপাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পমি আমাকে তার দু-হাত ও পা দিয়ে অসম্ভব ঠেলে দেয়। আমি কাৎ হয়ে তার শরীর থেকে ঝুকে পড়ি। সে পাশ ফেরে। উপুর হয়। চিৎ হয়। গড়িয়ে চলে যায় দেয়াল জোড়া বিশাল আয়নার মধ্যে। পমির প্রিয় আয়নায়। ভ্যাবলার মতন তাকিয়ে দেখছিলাম গোটা ব্যাপারটা। হঠাৎ সারা শরীর নড়ে ওঠে আমার, টের পাই। তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে ধরতে যাই তাকে। চকচকে ধারালো ঠাণ্ডা আমার আঙুল কামড়ে দেয়। শক্ পাওয়ার মতন হাত ছিটকে আসে। আয়নার মধ্যে থেকে হাসে পমি। অলস হাসি। সারা ঘর জুড়ে নীল আলো, নীল আলোটা পমিই অল্পক্ষণ আগে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ঘরের একপাশে ওই খাট, ওপরে সাদা মশারি। নীল আলোর মধ্যে হাড়ের মতো সাদা ভাসছে। ঘর লাগোয়া বাথরুম আর হা-খোলা দরোজা। ভেতরে অন্ধকার। টেবিল আলনা ও আলমারি একপাশে, এখানে মেঝের প্রায় মধ্যখ্যানে দুটো সোফা ও দুটো সেন্টার টেবিল। বেশ সাজানো গোছানো পমির ঘর। আমি সোফায় গা এলিয়ে পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে টের পাই শরীরে কোনো কাপড়চোপর নেই আমার, আয়নায় পমিও আমার মতন। হাতের কাছে সিগারেট না পেয়ে আরও বিতিকিচ্ছিরি লাগে, ‘একি মাইরি’, পমিকে বলি, ‘কোনো মানে হয়!’

পমির মুখ সামান্য হাঁ হয়। মনে হয় সে কিছু বলছে, কিন্তু কোনো আওয়াজ ভেসে আসছে না। শুধু আয়নায় সে হাসা। তার নিঃশব্দ অচল প্রবল হাসিতে সারা ঘর লাল হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের জন্য। আমি ডাকি, ‘এই পমি’। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে সে শুনবে না। হাত নেড়ে তাকে বেড়িয়ে আসতে বলি। উপুর হয়ে পড়ে আছে

তার শরীর। সে মাথা তোলে, সাপের ফণার মতন আদ্দেক শরীর আয়নায় উঠে যায়। ফণার মতনই দুলে ওঠে। বুক থেকে স্তন দুটি ঝুলতে থাকে পাকা দুটি ফলের মতন।

'কি আসবে না?' আমি তাকে ইশারায় বলি, 'আমি চলছি মাইরি'। সে আমাকে জিভ বের করে দেখায়। আমি আমার পাজামা পাঞ্জাবি পরে ফেলি; হাত তুলে দেখ াই তাকে, অর্থাৎ এবার বিদায় নিচ্ছি। ঠিক এসময়ে দরোজায় খট্‌খট্‌খট্‌। এ নিয়ে চার বার। পমির আরেকজন খদ্দের এসে বাইরে অপেক্ষা করছে অনেক্ষণ। নিশ্চয়ই রেগে গেছে লোকটা। খুব সম্ভব টেনে এসেছে। এগিয়ে গিয়ে আস্তে দরোজা খুলি। দু'হাতে দুই মদের বোতল, মাথায় তালপাতার টুপি। সে ঢুকেই বলে, 'এ কি!'

'ঠিক আছে আমি যাচ্ছি!'

'না না। আমাকে বিপদে ফেলে—বসুন মশাই—বোতল খুলুন দেখি, দুজনে মিলে পমিকে বের করা যায় কিনা।'

আমি এ-পাশ ও-পাশ তাকিয়ে 'কাজ ছিল' বলি।

'অসম্ভব!' সে মাথা নাড়ে, 'হবে না মশাই আমাকে বিপদে ফেলে'।

কয়েদির মতন আমি নিরুপায়, সোফায় বসে লোকটার দেওয়া সিগারেট ধরাই। বাথরুম থেকে একাই কলাই করা মগ জোগাড় করে সে। বোতলের মুখ থেকে শোলার ছিপিটা খুলে মগে ঢালতে ঢালতে সে গুণ গুণ গায়। পা দোলায়।

'কখন এই ব্যাপার?' জিগ্যেস করে সে।

'আরে বলবেন না, ঠিক সেই সময়ে।'

'তাই নাকি হাঃ হাঃ।'

পুরো এক মগ সে কমণ্ডুল থেকে জল ঢালার মতন করে গলায় ঢেলে দেয়। ঢেঁকুর তোলে। লোকটা যেন মৃদু গেলবার জন্যই এখানে ছুটে এসেছে। আমাকে সে পুরো এক মগ দেয় না, কম করে দেয়। খুবই নীচু জাতের মদখোর। তৃতীয় মগ মদ আয়নার দিকে তুলে ধরে ঘর ফাটানো চিৎকার করে, 'পমি-ই-ই-ই' ডাকে পমিকে।

পমি এতক্ষণে উপুর হয়েছিল। ঘাড় অব্দি ছাঁটা লালচে চুলগুলো গালের উপর পড়ে ছিল। এখন সে ধীরে ধীরে চিৎ হয়। স্তন যুগল তার নড়ে ওঠে, একবার, পরে স্থির হয়। পা-দুটোকে প্রথমে সে ছড়িয়ে দেয়, আবার জড়ো করে আনে। লজ্জা, টজ্জা ওর কোনোকালেই ছিল না, তবুও বুকের উপর একটা হাত রাখে সে, অন্য হাত চলে যায় নীচে তল পেটের উপর। এরকমভাবে সে শুয়ে থাকে।

'নাঃ, এ কি ব্যাপার মাইরি!' লোকটা বিরক্ত মুখে পান করে।

'আমি চলে যাব বুঝলেন, কাজ আছে। আপনি চেষ্টা করে দেখুন।'

'না না। বসুন বসুন, আপনারইতো হয়নি মশাই।'

বসে থাকতে হয়। ড্রেসিং টেবিল জোড়া প্রসাধনের নানারকম শিশি কৌটো। ছোট্টো তেপায়ার উপর কাপড়ঢাকা ট্রানজিস্টর সেট। আলনায় শায়া শাড়ি ব্রা সোয়েটার, খাটের নীচে গ্রামাফোনের বিশাল বাক্স। দেয়ালে হাওয়ার্ডস-এর ক্যালেন্ডার . . . বিচালির উপর নগ্ন নিতম্ব রূপসী বিদেশিনী। চোখ আবার আয়নায় যায় আমার। পমি চোখের কোণা দিয়ে দেখছে আমাদের, মিচকে শয়তানির মতন হাসে সে একটু একটু। 'এই দ্যাখ দ্যাখ', লোকটা একশো টাকার একটা নোট দেখায়। পমি হাসেশুধু। লোকটা অশ্লীল গাল দেয়। পমি হাসে।

'আমাদের উপর এত যদি ঘেন্না হয় তাহলে নটীপাড়ায় নাম লিখিয়েছিস কেন? খানকি মাগিকে দেখাব আজকে, বেলুনের মতো ফাটাব মাইরি।' লোকটা হঠাৎ ক্ষেপে যায়, 'দাঁড়া তোর ছেনালি ছোটাব।'

পমি হাসতে হাসতে কাৎ হয়। উপুর হয়। লোকটা কাপড় জামা খুলতে শুরু করে। 'ধরুন এগুলো। দাঁড়ান দেখাচ্ছি হারামজাদীকে।' মনে হয় সে নদীতে ঝাঁপ দেবে, সে রকম ভাবে তৈরি হয়ে নেয়। সহসা পমি আস্তে আস্তে উঠেদাঁড়ায়। সারা শরী আমার স্থির হয়ে যায় তার ওই বিপল উঠে দাঁড়ানো দেখে। আমি দেখি তার জানু নাভি পেট স্তন ও চুলের বিপুল উত্থান। উঠে দাঁড়ায় ও অল্প কোমর দোলায়। লোকটা আরও ভীষণ ক্ষেপে গেছে। লোহার রডের মতন তার লিঙ্গ, সোজা ও শক্ত। পমি বেশ জোরে শরীরটা দুলিয়ে দেয়, মানে সে নাচ শুরু করল। এক লাফে লোকটা বিছানায় ওঠে। বিছানা থেকে আয়নায় একটা প্রচণ্ড ঝাঁপ। খুব স্বাভাবিকভাবে সে ছিটকে পড়ে বিছানায়। কিন্তু দমে না সে। আবার উঠে দাঁড়ায় ও তার ক্ষিপ্ত লিঙ্গ চেপে ধরে আয়নায়। আয়নার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে শুক্রধারা। পমি তখন আয়নায় নির্বিকার ভাবে নেচে যাচ্ছে, ঘন ঘন কেঁপে উঠছে তার দুই স্তন ও নিতম্ব।

. . . তার মুখের দিকে তাকাই আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠি। দেখি সেই মুখ, যে মুখ আত্মহত্যার এক মুহূর্ত আগে দেখেছিলাম। ■

(রচনাকাল ১৯৬৭)